অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কামড়

না নেই।

কোথাও নেই।

মহীতোষ এ সময় নিজের ঘরে বসে থাকে। তার নিজস্ব কাজকর্মে ডুবে থাকে। চা দিতে এসে সুর দেখল ঘর খালি। বাথরুমে যদি যান। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা না খেয়ে তিনি প্রায় নড়েন না। বাথরুমে যাবেন কেন! কিংবা ছোটোবাবুর ঘরে। ছোটোবাবুর ঘরটা খালি থাকলে তিনি সকালে কখনও কখনও সে ঘরে যান। দোতলার একপাশে ঘরটা। পাশে বারান্দা। কদিনের জন্য ছোটোবাবু এসেছিলেন, সকালে উঠেই ছোটোবাবুর ঘরে গিয়ে ডাকতেন, ওঠ। কত বেলা হল। আসলে যেন ছোটোবাবুর জন্যই মহীতোষ উপরে উঠে যান। কথা বলার মতো ওই একজনই আছেন—দেরি করে উঠলে তিনি কেমন ফাঁপরে পড়ে যেতেন।

ছোটোবাবু কালই গেছে। যাবার সময় বাবাকে বার বার বলে গেছে, তুমি আর এসব নিয়ে ভেব না। ওদের ভালোমন্দ ওরা বুঝবে। নির্বিকার থাক। তোমার তো অনেক কাজ। নিজের কাজে ডুবে যাও।

সিঁড়ি ধরে নামছেন। সুর জানে কে নামছেন। বছর খানেক হয়ে গেল, সে এ বাড়িতে আছে। কার পায়ের শব্দ কী রকম সে জানে। বৌমা নামছেন—তার নামার শব্দ একরকমের, বড়ো দাদাবাবুর পায়ের শব্দ একরকমের। ওপরে মাসিমা থাকেন। সকালে স্কুল, পাঁচটায় বের হয়ে যান।

এখন এবাড়িতে বৌমা সিঁড়ি ধরে নামছেন। বাসি সায়া-শাড়ি-চাদর, ভিজালে এক বালতি। ঠিকা কাজের মেয়েটা চুপি চুপি বাবুর কাজ থেকে মাইনে গোপনে দ্বিগুণ করে নিয়েছে। মাসিমা জানলে অশান্তি করবে ভেবেই চুপি চুপি তাঁকে গোপন অনেক কাজ করতে হয়—যেন যুদ্ধক্ষেত্র। অথচ সুর ভেবে পায় না, এত বেলা করে কেউ ঘুম থেকে উঠতে পারে! তার খারাপ লাগে। শত হলেও বাড়ির বউ!

বৌমা বাবু নেই!

নেই তো আমি কী করব?

না, কোথায় গেল! তিনি সকালে চায়ের জন্য নিজের ঘরে বসে থাকেন।

দেখ ওপরে আছে কী না?

না ওপরে নেই।

সুর কিছুটা ফাঁপরে পড়ে গেল। মানুষটা কোথায় গেল? সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। তিনি তো সকালের চা না খেয়ে ঘর থেকে কোথাও যান না। ছোটোবাবুর ঘর দেখল, ফাঁকা। বারান্দার ইজিচেয়ারে যদি বসে থাকেন না নেই। মাসিমা স্কুলে, কোথাও যাবার কথা থাকলে রাতেই সুরকে বলে দেন, উনি সকাল সকাল বের হবেন। তাও বলে যাননি। এত সকালে তো কোথাও যাবার কথা না। বুধ-শনি বাজারে যান। আজ তো বুধও নয় শনিও নয়।

সুর একতলা-দোতলা সব জায়গায় খুঁজল। চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। নীচে নেমে চায়ের কাপ, প্লেট দিয়ে ঢেকে দিল। বছর খানেক থেকেই বুঝেছে, এ বাড়িতে একটা চাপা অশান্তি আছে। মহীতোষ যেন পুত্রবধূর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। মাসিমাও কথা কম বলেন। সারা সংসারে দাপাদাপি শুধু বৌমার। এই সে বাড়ি, তার ঘর, তার আসবাবপত্র সব কিছুই যেন বড়ো বেশি খোলামেলা। বৌমার আত্মীয়স্বজনরা এলে সমারোহ বেড়ে যায়। সুর দেখেছে, বাবুর আত্মীয় স্বজন এলে বৌমা পছন্দ করেন না। কিন্তু বৌমাটি বুদ্ধিমতী, বুদ্ধিমতী না ধূর্ত সে ঠিক বোঝে না। যতক্ষণ বাবুর আত্মীয়স্বজন থাকে খায়, তাদের নিয়ে সাধ আহ্লাদের শেষ নেই। চলে গেলেই মেজাজ গরম।

বাবুর আত্মীয় স্বজনরা যে খুবই গরিব তারা এলে সে তা টের পায়। বাবুকে দেখেছে, একে ওকে লুকিয়ে টাকা দিতে। যেন কেউ না জানে। মাসিমাও পছন্দ যে খুব করেন

বাবুর আত্মীয়স্বজনকে মনে হয় না। মাসিমার এক কথা কত টাকা দিলে?ঠ বাবুর সোজা এক কথা, দিইনি।

সব চেয়ে বোধহয় বাবু কষ্ট পান ছোটো ভাই মনতোষের জন্য। বাবুর সঙ্গে চেহারার কোনও মিল নেই। এলে কেমন চোরের মতো চলাফেরা। যেন বাড়িটায় ঢোকা তার মতো মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। বাবু বাড়ি এলে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। সারাক্ষণ বড়দার পাশে বসে থাকবেন। মুখ কাঁচুমাচু করে কথা বলেন— কী বলেন, কান পেতে শোনার কারও আগ্রহ না থাকলেও বৌমাটির আগ্রহ খুব। সে দেখেছে, দরজার আড়ালে দাদা ভাই কী বলাবলি করছে দাঁড়িয়ে শোনার আগ্রহ খুব। তারপরই মুখ কালো করে দুপদাপ সিঁড়ি ভাঙা। এবং নিজের পাঁচ বছরের পুত্রটিকে অকারণ পেটানো—কী হচ্ছে! একদম পড়ায় মন নেই। কে খাওয়াবে? তিনি তো দানছত্র খুলে বসে আছেন।

মাসিমারও একই অভিযোগ–দানছত্র।

বাবু শুধু শোনেন। ক্ষোভে মুখ লাল হয়ে যায়। সংসারে অপচয় দেখলে মাথা ঠিক রাখতে পারেন না। তখন নিজের উপরই কেমন এক তাঁর প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে।

কী খাবে না?

না। শরীর ভালো নেই।

কাল একটা চিঠি নিয়ে বসেছিলেন। বোধহয় বাবুর অফিসের ঠিকানায় চিঠিটা এসেছে। বাবুর মা লিখতে পারেন, ছোটোভাই লিখতে পারে—যেই লিখুক বাবু চিঠিটা বার বার পড়ছিলেন।

কী লেখা আছে কে জানে!

সুর সামান্য লেখাপড়া জানে, ইচ্ছে করলে সে গোপনে চিঠিটা পড়তে পারত। কিন্তু বাবু কেন যে বাড়ির চিঠি এলে সতর্ক হয়ে যান সে বোঝে না। হয়তো জানাজানি হয়ে গেলে মাসিমার অশান্তি বাড়বে, পুত্রবধূরও নির্যাতন শুরু হয়ে যাবে পুত্রের উপর। বাবুর বড়ো পুত্রটি তো গোবেচারা—সেও কেমন অকলে পড়ে যায় মাঝে মাঝে যখন লাভা উৎক্ষেপণ শুরু হয়, সুর বোঝে, কী নিয়ে অশান্তি। বড়ো দাদাবাবুর এক কথা বাবার টাকা যা খুশি করবেন। তাঁর তো দায় শেষ। তিনি যদি টাকা দেন আমরা বলার কে? তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলবেন, তুমি কি কিছুর অভাব বোধ করছ? এত টাকা কী করো!

সর-এর এটাই প্রশ্ন। বড়ো দাদাবাবুর সরকারি চাকরি। মাস গেলে গুচ্ছের টাকা, মাসিমার মাস গেলে মাইনে, বাবু দু-হাতে রোজগার করেন এখনও। ছোটো দাদাবাবুও কম যায় না। অথচ সংসারে বাবুকে দেখলে তার কষ্ট হয়।

সুর কাল দেখেছিল, চিঠিটা পড়তে পড়তে কেমন অনামনস্ক হয়ে গেছেন। ফোন বাজছে, সেটা যে উঠে গিয়ে ধরা দরকার, তাও যেন খেয়াল নেই। বড়ো দাদাবাবু নীচে নেমে ফোন ধরলেন। বাবা, তোমার ফোন।

কে ফোন করছে?

কী জানি! নাম পার্থ বলছে। কাগজ থেকে।

বাবু উঠে গিয়ে ফোন ধরে বললেন, পার্থ? শোনো ভাই–আজ থাক। না, আজ না। বলেই দরজা বন্ধ করে বসে থাকলেন।

যেন তিনি ভিতরে ভিতরে খুবই ভেঙে পড়ছেন। বৌমা পাশের ডাইনিং স্পেসে মোটামুটি যুদ্ধ করছে পুত্রটিকে নিয়ে। কিছুই খাবে না। বৌমাও না খাইয়ে ছাড়বে না।

পাঁচ বছরের শিশু পুত্রের জেদ দেখে সুর মাঝে মাঝে ভাবে—গোল্লায় কেন যায় এই শিশুর জীবন প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বুঝতে শিখে গেছে তার জেদের কাছে সবাই কাৎ। সকাল থেকেই একচোট শুরু হয় খাওয়া নিয়ে। স্কুলের বাস না আসা পর্যন্ত তা চলে।

খাও বলছি। খাচ্ছ না কেন! না খেলে বাঁচবে কী করে? দু-পিস পাউরুটি, ডিমের পোঁচ, সন্দেশ। খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

মহীতোষ রোজই দৃশ্যটা দেখেন। কিছু বলেন না। মুখ তাঁর গম্ভীর। তিনি বেসিনে মুখ ধোয়ার সময় চোখে জলের ঝাপটা দেন কেন এত সুর বোঝে না।

কাল সকালে চিঠিটা পড়ার সময় কেমন থমথম করছিল মুখ।

শিশুটির মা, পেট ভরবে কী করে, বাঁচবে কী করে বলে উঠে যান। ফ্রিজ থেকে কলা, আম, লিচু, আঙুর সাজিয়ে দেন শিশুটিকে। তাও কেমন আধখ্যাঁচড়া করে খায়। ভাত, মাছ ভাজা, মাখন দিয়ে আর এক প্রস্থ চেষ্টা। কিছু খায় কিছু ফেলে।

মহীতোষ একদিন ক্ষোভে দুঃখে বলেছিলেন, বৌমা খিদে পেলে ঠিকই খাবে। জোর করতে যেও না।

খিদে পেলে ঠিকই খাবে কেন বলছেন মহীতোষ— বৌমাই বোঝে। অর্থাৎ এটা বাড়াবাড়ি। মহীতোষ যেন আভাসে তা জানিয়ে দেন।

সুর চিঠিটা খুঁজল। বৌদি ছেলেকে বাসে তুলে দিতে গেছে। বড়ো দাদাবাবু অফিসে বের হয়ে গেছেন। মহীতোষ কোথায় কেউ জানে না। কারও দায় নেই জানার। লোকটা মরল কী বাঁচল—এক মাসিমা ফিরে এলে ত্রাসের মধ্যে পড়ে যাবে। যদি তিনি সত্যি নিখোঁজ হয়ে যান!

সুর দেখল, চিঠিটা দেরাজের মধ্যেই আছে। বাবুর ছোটো ভাইয়ের চিঠি। সে চেনে মনতোষদা লিখেছে, দাদা আগুনের হলকা বইছে। সব জতুগৃহ। কাজ কর্ম্ম নাই। তুমি যে টাকা পাঠাও ওতে চালের দাম হয় না। পাঁচটি মুখ, আগুনে পুড়ে মরছি। সারাদিন খাটলে বারোটা টাকা। যদি এ-মাসে কিছু বেশি টাকা দাও ভালো মাঠঘাট আংড়া, কাজ নাই। কোনোদিন হয়, কোনদিন হয় না।

হঠাৎ মনে হল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

তাড়াতাড়ি চিঠিটা রেখে দিয়ে দরজায় উঁকি দিতেই দেখল মহীতোষ নেমে আসছেন। সারা শরীরে ঘাম। মুখ পুড়ে গেছে। ছাই রঙের হয়ে গেছে।

আপনার চা, ঠান্ডা হয়ে গেছে। খোঁজলাম। কোথায় ছিলেন।

ছাদে।

ছাদে। সুর অবাক হয়ে গেল। বৈশাখের দাবদাহে সব পুড়ছে। বৃষ্টি নেই। গাঁয়েগঞ্জে আকাল। তেষ্টার জল নেই-নদী খুঁড়ে বালি তুলে দুক্রোশ দূর থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে মাটির ঘড়ায়—সে কাগজে এমন ছবি দেখেছে। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে সুর টানা দু-তিন ঘণ্টা হাতে সময় পায়। তার আলাদা ঘর আছে সেখানে সে তখন কাগজ পড়তে

পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে। তার কোনও অসুবিধা না হয়, সবার এটা যেন দায়িত্ব। সে জানে বাড়ির চাকাটা সচল রাখার দায় তার। সে বেগড়বাই করলেই সব যাবে। তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা সবার।

যেন সুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে আটকে রাখা। তার দেশে ঝুপড়ি মতো ঘরে মা আছেন। দুই লায়েক ব্যাটা আছে। সেখানেও জলের আকাল, ভাতের আকাল-চাষ আবাদ না থাকলে গাছের মরা ডাল। মট করে যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে।

এই রোদে ছাদে! অসুখে পড়ে যাবেন।

মহীতোষ জানে, কাজের মেয়েটি একটু বেশি বাচাল। সে নিজেকে বাড়ির একজন ভাবে। তার দাপট আছে। যে গোরু দুধ দেয় তার লাথি খেতে কষ্ট হয় না। মহীতোষকে এত প্রশ্ন করার স্বভাব সেই সাহসেই।

ছাদে কী করছিলেন?

দাঁড়িয়েছিলাম।

দাঁড়িয়ে থাকলেন! রোদে কেউ এমনি এমনি দাঁড়িয়ে থাকে? তাও খালি পায়ে। ছাদে কী তাপ। পা রাখা যায় না।

মহীতোষ কোনও কথারই জবাব দিচ্ছে না। চুপচাপ নিজের ঘরে ঢুকে একটা চিঠি লিখল মনতোষকে। মনি অর্ডার ফর্ম তার দেরাজে থাকে— সে এ-মাসে টাকা বেশি করে পাঠাল। মাকেও টাকা পাঠায়—এই দায় তার এখনও আছে। ঝুমির বিয়ে পাকা, শুধু সে ঘাড় পাতলেই হয়ে যায়। পাত্রপক্ষ পনেরো হাজার টাকা নগদ চেয়েছে। মুদি দোকান আছে। চায় ভাই। বিধবা মা, শহরের কাছে টালির বাড়ি।

মহীতোষ ইদানীং কিছু কিছু ব্যাপারে ফেঁসে গেছে। তার আয়কর বাবদ বড়ো অঙ্কের টাকা সরকারের ঘরে জমা দিতে হযে। পাঁচ সাত বছর তার চাকরি আছে। কোম্পানির অবস্থা খারাপ—গো স্লো, ইউনিয়নের হুমকি ধর্মঘটের। কোটি টাকার উপর বাকি প্রভিডেন্ট ফান্ড-এল আই সি, ই এস আই বাবদ। ধারদেনা, কোম্পানির লোন ব্যাঙ্কের কাছে তার ঋণ শোধ দিতে মালিক পক্ষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। তার বাইরে সে কিছু টাকা আয় করে থাকে—বই বিক্রি হয় তার বেশ ভালো। স্কুলের বই। এখন বাজারে টেক্কা দেবার মতো তার বই-এর সমকক্ষ আরও বই বের হয়ে গেছে। স্কুলগুলি নানাভাবে উৎকোচপ্রিয় হয়ে গেছে। বই ধরাবার জন্য সবাই হন্যে হয়ে ঘুরছে। সঙ্গে টাকার থলে, হয় টিভি নয় গোদরেজের লকার—কিছু একটা উপহার হিসাবে দিলে, দু-পাঁচটা বই প্রকাশকের লেগে যায়। মহীতোষ আর আগের মতো টাকা উপার্জন করতে পারে না। সে এইসব নানা ঝামেলায় ত্রস্ত হয়ে পড়ছে।

মহীতোষ আজ সকালে ছাদে দাঁড়িয়ে দেখেছিল, রোদের তাপ কত প্রখর হতে পারে। একজন মানুষ এই কড়া রোদে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

এটা তার এখন এক ধরনের মজা।

যেমন একদিন সবাই দুপুরে ঘুমিয়ে আছে। সে ছাদে খালি পায়ে দাঁড়িয়েছিল। সে ফ্রিজের ঠান্ডা জল খায় না। সে শুধু ডাল দিয়ে ভাত মেখে খায়। সকালে মুড়ি চিবোয়। আগে তার সকালের খাবার ছিল চার পিস টোস্ট, ডিমের পোচ, দুটো মিষ্টি এবং একটি মর্তমান কলা।

এক দুপুরে সে স্ত্রীর কাছেও ধরা পড়ে গেল!

ওমা কী সর্বনাশ! তুমি রোদে দাঁড়িয়ে আছ! কী হয়েছে! কেন দাঁড়িয়ে আছ! তোমার মাথা ঠিক নেই। আমাকে আর কত জ্বালাবে। নামো বলছি।

মহীতোষ নেমে এসে বলল, আমি বাড়ি যায়।

যাও যেখানে খুশি যাও। এই গরমে তুমি বাড়ি যাবে! আলো নেই, পাখা নেই। মাটির ঘর, জানালা নেই। অসুখ বিসুখ হলে কে দেখবে?

কাউকে দেখতে হবে না। এবং পরদিন সকালে সে সত্যি এক জামা কাপড়ে বের হয়ে গেল–কাউকে কিছু না বলে!

সুর দেখল, ঘরে তিনি নেই। তবে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কী যে মজা পান—না মাথায় গোলমাল, কে জানে—সে ছাদে গিয়ে দেখল, নেই।

নেই। নেই।

ঝুমি সকালে উঠে দেখল গাছতলায় কে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এত সকালে ঝুমি ঘুম থেকে ওঠে না। এবারের সমন্দ ভেঙে যাওয়ায় ঠাকুমা খুবই ভেঙে পড়েছে। চোপা করেছে, শাপ-শাপান্ত করেছে বৌদের। ঝুমি বিরক্ত হয়ে বলেছে, ঠাম্মা চুপ করবে কি না বল!

কাকাকে চিঠি লিখতে বলেছিল, মহীতোষকে বাড়ি আসতে বল। সে নিজে গিয়ে যদি একবার চেষ্টা করে।

ঝুমির এক কথা, আমি পারব না। কাকাকে দেখছি তোমরা সবাই মিলে মেরে ফেলবে। কাকা এসে কী করবে! আমি তোমার গলার কাঁটা। যাব যেদিকে চোখ যায় বের হয়ে।

ঝুমির বয়েস হয়ে গেছে। দেখতে খারাপ না। কাকা তো বলবেন ঝুমি আমাদের প্রতিমার মতো দেখতে। রংটা শুধু চাপা। কাকা নিজে চেষ্টা করতে পারতেন, কাকিমার ভয়ে চুপ। কী নিয়ে অশান্তি শুরু হবে সে জানে। কাকিমার এক কথা, মানুষটাকে সবাই মিলে মেরে ফেলবে। ঝুমি বোঝে কাকিমার অভিযোগ খুব মিছে নয়। বাড়ির আর সবাই বাবা এবং অন্য কাকারা তার কথা খুব ভাবে বলে মনে হয় না। বাবা তো বলেই দিয়েছে, আমি রিটায়ার করেছি। পেনশনের টাকায় চলে না। ঝুমির নীচে আরও পাঁচ বোন। তারা সবাই বাবার কাছেই থাকে। কেবল সে থাকে ঠাকুমার কাছে।

আগে সংসারটা এমন ছিল না। দাদু বেঁচে থাকতে বাড়ির চারপাশে যেন আশ্চর্য সমারোহ ছিল। কাকা টাকা পাঠাতেন, দাদু আড়তে কাজ করতেন জমিজমা চাষ-আবাদ মিলে বারো মাসে তেরো পার্বণ। গৃহ-দেবতার পূজার আয়োজন তাকেই করতে হত। ফুল তোলা থেকে, ঠাকুরের বাসন-কোসন মাজা সব। বড়ো পিসির টিউসিনি করে টাকা উপার্জন। ছোটো কাকার পাটের দালালি, তাতেও দু-পয়সা-এই করে সংসারে কোনো টান ছিল না। দাদু মরে যেতেই সংসারটা কেমন আলগা হয়ে গেল। সেজ কাকা, ছোটো কাকা ভিন্ন হয়ে গেল। ঠাকুমার খবর নেয়, তবে টাকাপয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করে না। কাকা দাদুর কাজ হয়ে যাবার পর ভাইদের ডেকে বলেছিলেন, মার জীবিতাবস্থায় বাবার সামান্য জমি-জমা, গাছপালা বাগান যা আছে তিনিই ভোগ করবেন। তোমরা হাত দেবে না।

ছোটো কাকাকে দু-দুবার দোকান করে দিল—ফেল। এখন তো দোকান বন্ধ। ছোটো কাকার জন্যও তার কষ্ট হয়। তবে কাকিমাটি যা একখানা, এত মুখ করে আর এমন সব লাগানি ভাঙ্গানি চলে যে কষ্টটা কেন যেন মাঝে মাঝে বুক খালি করে উবে যায়। তখন তারও রাগ, বোঝে এবার ঠাকুমাকে তড়পে এসেছিলে, গাছ বিক্রি করতে দেবে না বলেছিলে, বোঝো এবার।

গাছ বিক্রি করলেই মনতোষ মা-র উপর ক্ষেপে যেত। তার এক অভিযোগ, দাদা ফল খেতে বলেছে, গাছ বিক্রি করতে বলেনি। তুমি গাছ বিক্রি করে কী কর বুঝি না। ঝুমির নামে ব্যাঙ্কে টাকা রাখছ। দাদাকে মিছে কথা বলে বেশি টাকা আনাচ্ছ। দাদাকে দাঁড়াও সব লিখব।

ঝুমি তখন আর সহ্য করতে পারে না। মাটির ঘর। টিনের চাল। চারপাশে টালির বারান্দা। বাঁশের খুঁটি। নড়বড়ে হয়ে যায়! কী দিনকাল! কাকা দুজনের ভরণপোষণের বাবদ যা দেয় তাতে চলে না। ঠাকুমা গাছ বিক্রি করে, বাঁশ বিক্রি করে বাড়তি কাজগুলি সেরে নেয়। তুই পেটের ছেলে! সহ্য হয় না!

সামনের দিকে মনতোষ তার ঘর তুলে আছে। একখানাই মাটির ঘর। সামনে সঙ্গের বারান্দা, পেছনে বাঁশের খুঁটি দিয়ে গোয়াল। গোরুটা অভাবে পড়ে বিক্রি করে দিয়েছে। মনি অর্ডার এলে মনতোষের দৌড়ে যাওয়ার স্বভাব। দাদা তার নামে যদি মাসোহারা পাঠায়।

এই একটা আশায় সে বসে থাকে। মাঝে মাঝে আসে। আবার কোনো মাসে আসে না। চিঠি আসে। আগামী মাসে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি থাকে। মনতোষ বোঝে, দাদার কাছে আবার না গেলে চলবে না। পাঁচ-পাঁচটা মুখ। পুত্র সন্তান দুটি তার স্কুলে পড়ে। ঠিক পড়ে না, বলতে গেলে টিফিনে পাউরুটি পাওয়া যায়। দু-ভাই মিলে পাউরুটি নিয়ে এলেও কিছুটা যেন পেটের দায় মেটে।

তার এক কথা, ও নলিনী, দাদা মাকে কত পাঠাল?

যা পাঠায়।

তুমি মনে রাখতে পার।

তা পারব না। এ-মাসে বেশি দেয়নি।

বেশি দিলেই মনতোষ গড় গড় করবে।–মা নাতিনকে আর দুটো হিন্দি সিনেমা বেশি দেখাতে পারবে। নিজের থান না কিনে ঠিক নাতনিকে শাড়ি কিনে দেবে। আমরা তো সব কলাগাছ ফুড়ে হয়েছি। একবার দ্যাখে, তারপরই লাঠি নিয়ে তাড়া, এই তারক আবার যদি ওদিকে যাস ঠ্যাং ভেঙে দেব। ধীরু তোর ছাল চামড়া তুলে নেব। বুড়ি

তোদের কেউ হয় না। আমার কেউ হয় না। তারপরই লাফিয়ে গাছে উঠে যায়। ডাল কাটতে থাকে।

মনতোষের কেমন মাথা ঠিক থাকে না। অভাব অনটনে মনতোষ মাঝে মাঝে আগুন জ্বালিয়ে দিতে চায়।

সেই মনতোষ মাকে বলে গতকাল সারা উঠোন কুপিয়েছে। হাতে কাজ নেই। ইটের ভাটায় কাজ নেই। আর সে পারবে কেন! কোমরে ব্যথা। এদিকে ঘরে এক মুষ্টি আটা পর্যন্ত নেই। সে যে কী করে! তখনই বুঝি ফন্দিটা কাজ করেছিল মাথায়।

সে ডালিম গাছটার কাছে নীচু হয়ে বসে কী দেখল।

আজকাল সে কিছু তুকতাক শিখেছে, তার গুরু নাদুঠাকুর। নাদুঠাকুরকে–ও মানে। এই যে এবারেও সমন্দ ভেঙে গেল, কোন গুণের প্রভাবে। কিন্তু সেটা কীভাবে চাল দেবে সারারাত ভেবেছে। জল পড়া, চাল পড়া কত রকমের তুকতাক আছে। মা-র বোকনা হাফিজ। কে নিল।

ঝুমি তখন কলকাতায় কাকার কাছে। পাশের কুমোরদের মেয়ে পাতিকে শুতে বলে গেছে রাতে। তা পাতি আরও কয়েকবার থেকেছে। ঝুমির জন্য পাত্রপক্ষের খবর এলেই দিনক্ষণ মাসখানেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। মাস দেড়মাস ঝুমি কাকার কলকাতার বাড়িতে

থেকে এলেই শহুরে মেয়ে। লাবণ্য জমে যায় শরীরে। রং খুলে যায়। বাধা জায়গায় থাকলে যা হয়। কলকাতায় জলের গুণটা টের পেতেই মা বছরে এক দু-বার ঝুমিকে মহীতোষের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। সাওয়ারের জল, গন্ধ সাবান, স্যাম্পু কত কিছুর ব্যবস্থা স্নানের ঘরে। পাত্রপক্ষ দেখে পছন্দ করে ঠিক। তারপরই পাকা কথা দেবার সময় হলে আর কোনো খবর দেয় না। কে যে কানে তুলে দেয়, যা খোলতাই দ্যাখলেন দু-দিনের। তবে কি পাত্রপক্ষ টের পায় কলকাতার জল হজম না হলে বোঝা যাবে না। হজম হতে বেশি সময়ও বোধ হয় লাগে না। পাঁচ দশদিন যেতে না যেতেই কেমন শরীর চিমসে মেরে যায়। গাল বসে যায়। চামড়া পুড়ে যায়।—গাঁইয়া চেহারা, কে নেবে। স্কুল ফাইনালটা পাস করলেও হত। কিছুতেই মই বেয়ে উপরে উঠতে পারল না ঝুমি। বার বার হড়কে পড়ে গেল।

সেই ঝুমির বিবাহ এবারে পাকা।

বয়স নিয়ে পাত্রপক্ষের সঙ্গে মিছে কথা বলতে হয়। এবারের পাত্রটির খবর নিয়ে এসেছিল বড়োপিসি। বড়োপিসি ভাইঝিকে ছোটোবেলা মানুষ করেছে। পায়ে পায়ে ঘুরেছে। এখন পিসিরও সংসার হয়েছে। ছেলেরা বড়ো হয়ে গেছে। বড়োটা এবার ইস্কুল ফাইনাল দেবে।

আসলে ঝুমি বোঝে সে এখন তিনজনের গলায় কাঁটা হয়ে ফুটে আছে। একনম্বর ঠাকুমা, দু-নম্বর বড়োপিসি, তিন কলকাতার কাকা। লোকজন বাড়ি এলে মহীতোষের নাম আর

করে না। বলে কলকাতার ছেলে চিঠিপত্র দেয় তো! ঝুমিকে বলে তোর কলকাতার কাকা পূজায় কী দিল!

সবই গোপনে করতে হয়। লাগানি-ভাঙানি হচ্ছে দেখে ঝুমিকে এবার পিসির শহরের বাড়িতে দেখানো হয়েছে। সবে দু-দিন হল কলকাতা থেকে এসে ঝুমি শুধু পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে। পিসির এক কথা, তোকে কে বলেছে, কলকাতায় যেতে। ঝুমি কাজ ছাড়া থাকতে পারেনা। আর স্বভাব টিভি দেখা। পিসির বাড়িতে আছে, কলকাতার কাকার বাড়িতেও আছে। টিভির বিজ্ঞাপনের মতো জীবন যে নয়, সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

ঠাকুমার এক কথা, কম সমন্দ এল! ঝুমির বয়সি পাড়ার সব মেয়ে কবেই সাফ হয়ে গেছে। কপাল মন্দ না হলে হয়!

এত গোপন, এবং পাত্রপক্ষের সব দাবি মেনে নিয়েছে কলকাতার পুত্র তাঁকে ঠিক আপৎকালে রক্ষা করবে।

কলকাতায় এই বুড়ো বয়সে ছোটাছুটি।

মহীতোষও ভেবেছিল, এবারে তবে হয়ে গেল। বলেছে—যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তারপর কী না চিঠি না পাত্রপক্ষ পাকা কথা দিতে আসেনি। হাত থেকে এবারেও ডিম ফসকে চড়াৎ করে ভেঙে গেল।

মনতোষ মনে মনে খুশিখুশির কারণ এই বাড়ি, বাগান, গাছপালা সব সাফ করে দিচ্ছে মা। দাদাকে ইনিয়ে বিনিয়ে লিখছে—আর দাদাটিও মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য—বোঝে না, ঝুমি ছাড়া তার আর কারও প্রতি কোনো টান নেই। অন্য নাতি নাতিনরা কী সব জলে ভেসে এসেছে! একটা ফল পাকুড় পর্যন্ত ধরতে দেয় না। বলে কি না, ঠাকুমা দেখ ধীরু আবার গাছতলায় ঘুর ঘুর করছে। ঠাকুমা দেখ ছোটোকাকা আম পাড়ছে। আর তখন চোপা ঠাকুমার—নির্বংশ হবি, ধনেজনে যাবি। মরবি। গোলাম তুই আমার গাছে না বলে কয়ে উঠলি, ডাক শিবতোষকে। শিবতোষ, আলাদা বাড়ি করেছে—তার অভিযোগ, মনতোষ মানুষ নেই। অমানুষ হয়ে গেছে। বৌটা দজ্জাল। সে মাকে এক ধমকে তাড়িয়ে দেবে। বলবে, আমি কিছু জানি না, যাও।

শিবতোষ তেড়ে যাবে!

কেন, এখন কেন! কার জন্য বাড়ি ছাড়লাম। তোমার ছোটোপুত্র—আহা বোঝো ছোটোপুত্র, সে তেড়ে এসেছিল কেন। গলা টিপে ধরেছিল কেন—বল! আমাকে উৎখাত করে ছাড়লে। তোমরা সবাই। মেজদার মুখের দিকে তাকিয়ে মেনে নিয়েছি। আমাকে এখন লাগে কেন। ছেলেদের বলে দিয়েছি, আম খেতে হয় সাবর্ণদের বাগানে ঘুরবি-মরতেও বাড়ির আমবাগানে ঢুকবি না।

সুতরাং বুড়ো বয়সে মরণ!

মনতোষ জানে, এবারে একটা মোক্ষম সুযোগ এসে গেল তবে। সে ডালিম তলায় বসে ঘরে কী কথা হয় শুনছিল।

কী বলে!

ঝুমির গলা।

–ঠাকমা টোকা তুলতে গেছ তো আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে যাব। ঠাকমার কেমন চোখ বিবর্ণ হয়ে যায়। দুটো কচুর লতি তুলে এনেছিল সকালে। মেজাজ খারাপ বলে দুপুরে সেদ্ধভাত খেয়েছে। কচুর লতির উপর জল ছিটিয়ে চালে রেখে দেবে। ঘরবাড়ি গরমে জতুগৃহ–ঘরে টেকাই যায় না। মনে হয় আগুন, হলকা বইছে। আর তখনই কিনা বড়ো পিসি বলল, টোকা পোতা আছে কে বলল।

–ঝুমি ঠোঁট উলটে চোখ ট্যারচা করে দিল।

বড়োপিসি বুঝল মনা মানে মনতোষের পরামর্শ। কিন্তু নাদুঠাকুরের তুকতাকে তারও বিশ্বাস আছে। মনার সঙ্গে কথা বলতেও ঘৃণা হয় তার। তবে আপদকাল বলে কথা। মনা বাড়ির সবটা গ্রাস করবার তালে আছে। মাঝে মাঝে সে বলতেও ছাড়ে না, বাড়িতে কি আর লক্ষ্মী আছে। গাছের ডালে সব শকুন বসে আছে—বুড়ি মরলে উড়ে এসে জুড়ে

বসবে। দাদাকে সব না লিখে জানাচ্ছি তো, মুনিষ খাটছিস, দ্যাখ তোর আরও কত অধঃপতন হয়। ঠাকুর বাড়ির নাম ডোবালি। চুরি চামারি পর্যন্ত করতে শুরু করেছিস। মা-র নালিশ থেকেই দু-তিন সাল হল বুঝেছে কে নেবে—নেয় তোমার গুণধর ছোটোপুত্র। আচার্য বলেছিল না, ঠাউরকর্তা আপনেরে ছোটো পোলায় খাওয়াইব। খাওয়াচ্ছে না! গাছে নারকেল থাকে না— লিচু সাফ, আম, কাঁঠাল কিছু রাখতে পারছ!

কিন্তু আপদকাল বলে কথা। বড়োপিসি ঘরে বসেই ডাকল, মনা, মনারে!

উঠোনের সামনে রাস্তার ধারে মনার ঘর। মনা তো আর ঘরে নেই। সে ডালিমতলায় বসে। ঝুপড়ি আছে। শরীর আলগা করে বসেছিল। দিদির ডাকে, সে তাড়াতাড়ি নুয়ে গুড়ি মেরে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

আবার ডাকছে, মনা বাড়ি আছিস।

সাঁজ বেলা। ঘরে লম্প জ্বেলে দিয়েছে তারকের মা। সে দেখল, তিনটে মুখেই প্রত্যাশা-বাবা রাতে কিছু আনবে। সারাদিন এ-বাগানে সে-বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছে। এঁচড় চুরি করেছিল—জঙ্গলে রেখে এসেছে। কাল সকালে বাজারে যাবে না শহরে যাবে ঠিক করতে পারছিল না। যদি ধরা পড়ে যায়। এসব সাত পাঁচ ভাবনা মাথায়—দিদি ডাকছে, ডাকুক। মজা। কারণ সে জানে দিদি এল বলে। উঠোনে আমার মুততেও আসবে না। বোঝো এখন।

মনা আছিস!

লুঙ্গিটা উপরে তুলে বাঁধল মনতোষ। গায়ে হাড় ছাড়া কিছু নেই। পেট তালপাতার পাখার মতো ঠান্ডা মেরে পড়ে আছে। লুঙ্গি খুলে যায় বার বার।

কী হল! ডাকছি। সাড়া দিচ্ছিস না।

সে উঠোনে বের হয়ে বলল, বল।

বাড়িতে নাকি টোকা পোঁতা আছে!

নাদুঠাকুর তো তাই বলল।

কে পুঁতেছে।

কে জানে!

শরিকি ঝগড়া যেমন হয়ে থাকে। টোকা যদি মনা নিজেই পুঁতে রাখে। অভাবে বুদ্ধিনাশ। পুঁতে রাখতেই পারে। ঝুমিরও হয়েছে, বাড়ি বাগান বাঁশঝাড়ে কেউ ঢুকলেই তাড়া।

ঠাকুমার কাছে নালিশ। ঠাকুমার চোপার চোটে ভূত ভাগে। টোকা নিয়েও চেষ্টা করেছে দিনমান আমার আবাগী নাতিনের উপর তোদের কেন এত নজর রে ড্যাকরার বাচ্চা। ওলাওঠা হয়ে মরবি। কিন্তু পরে বুঝেছে বিধান মেনে না চললে ঝুমির উদ্ধার হবে না। বিকালেই খবর পাঠিয়েছে, বড়োমেয়েকে। শিবতোষ শুনে বলেছে, রাখ তোমার টোকা! টোকায় কী আছে!

মনা যে বলল, কালো ছাগলের নাদি আছে, ধনেশ পাখির পালক আছে। কুমারী মেয়ের রজস্বলার তেলকানি আছে। টোকা তুলতে না পারলে ঝুমির গতি করা যাবে না।

শিবতোষও তুকতাক বিশ্বাস করে। ওই তো গ্রীষের বৌটা জলে ভার হয়ে গেল। নাদু ঠাকুরের টোটকায় আরোগ্য লাভ করেছে। কী ভেবে বলেছিল, যা ভালো বোঝো করো।

তার নিজেরও কাচ্চাবাচ্চা আছে। কে কোথা থেকে তুক তাক করবে, গুণ করবে—যা দিনকাল, চালের কেজি পাঁচ টাকা। রেশনের চাল খাওয়া যারে না। সকালে উঠে গোরু সেবা, দুধ দোহানো—বাজারে দুধ বিক্রি, রোজের দুধ দিয়ে আসা, তারপর বগলে গামছা ফেলে ডোবার তলানি জলে ডুব—শেষে পড়িমরি করে আহার এবং সাইকেলে সরকারি অফিস। ফেরে পাঁচটায়। চারপাশে বনজঙ্গল, সাপখোপ, ইঁদুর বাদুর কত কিছুর উপদ্রব-বাড়তি উপদ্রবের ভয়েই সে বলেছিল, টোকা যখন পোঁতা আছে কিছু আর করার নেই। টোকা পুঁতে রাখলে তো সমন্দ ভেঙে যাবেই।

টোকাখান তুলতেই হয়।

তা মনা টোকা কোনখানে পোঁতা আছে জানস!

কী করে কই। বলল ত নৈঋত কোণে বড়ো চাঁপা গাছের নীচের দিক থেকে মাটি কোপাতে শুরু করতে হবে। না পেলে মরণ। কার কিছু করার নেই! পেলেও মরণ। আর একখান টোকা মন্ত্র তন্ত্র তালপত্র ভূর্জপত্র আরও কী সব মোক্ষম চালান দেবে, বাঙ্গ-বাক্স করে টোকা পোঁতা বের হয়ে যাবে। গলগল করে রক্ত ওগলাবে। তা ম্যাও লাগে। ম্যাও নিয়ে কথা।

কত ম্যাও লাগব।

মনা মাথা ঝাঁকায়। আর বলে মায়রে কও, আমার পুত্ররা গাছতলায় গেলে আগুন জ্বলে তেনার নাতিন এখন বয়স পার করে দিয়ে কুড়িতে বুড়ি। আর তুই দেড় কুড়ি বয়স-বিয়ার আর দরকারটা কী।

মনা ভালো হবে না। তুই আবার ঝুমিকে নিয়ে পড়লি। ঘর শত্রু বিভীষণ।

সবাই দিচ্ছি। তুমি নও! নাও আমি জানি না কত লাগব। নাদু ঠাকুরের কাছে যাও। তার মর্জি।

নাদু ঠাকুরের কাছে গিয়ে বড়ো পিসি শুনল, কোনো এক আমবাগানের বাবু ধরে নিয়ে গেছে। খুবই গুপ্ত কথা। বাবু নাকি কোনো পরস্ত্রীর জন্য পাগল। হিল্লে করতে গেছে। সারা সকাল এই করে গেল, নাদু ঠাকুর, ফিরল না। বড়ো পিসির মুখ ভার। এক কথা তার এই কী ফ্যাসাদে ফেলালিরে মা। তর নিজের ভাইঝি— তুই কইতে পারস না!

কইতে পারি।

তবে ক।

একশো এক টাকা টোকা তুলতে একশো এক টাকা পালটি টোকা পুঁততে। টোকা তুলে দিলেই হবেখন! পালটি মারতে হবে না। নাহলে, আবার টোকা যদি পোঁতে ফের একশো এক টাকা। পুঁতলেই একশো এক টাকা!

ঝুমি দেখল ছোটো কাকার উঠোনে পিসি কপালে হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

টাকা দিব কে?

ক্যান দাদা। মায় লিখলেই হয়ে যাবে। টোকা পুঁততে তুলতে পুঁততে।

মনা!

মনতোষ এবার ঠাণ্ডা মাথায় বলল, দশটা টাকা দে দিদি। পুত্ররা কিছু খায় নাই। দাদা টাকা পাঠায় নাই। দে। দাদার টাকা এলে দিয়ে দেব। দে দিদি। কাল সকালে উঠে টোকা তুলে দিলে বাকি টাকা দিতে বলবি মাকে।

বড়োপিসি আর কী করে। অতিকষ্টে দশটাকার নোট বের করে বলে, টোকা খুঁজে না পেলে, ফেরত দিবি।

তা দেব না! আমি মাগনা কারো কাছে কিছু চাই না।

সেই টাকার চাল ডাল নুন— খিচুড়ি মহোৎসব। সকালে মনতোষ, একজন যোগলদার সঙ্গে নিয়ে কোপাতে থাকল। সারা উঠোন কুপিয়ে ফালা ফালা করে দিল। কোথায় টোকা পোঁতা আছে! সে গড় গড় করছিল। নাদু ঠাকুর তুমি তো জায়গাসোন দেখিয়ে গেলে পারতা। তা টৌকা-তো মেলে না। সারা উঠোনে মনা হম্বিতম্বি করে বেড়ায়। অদৃশ্য হবে। এত বড়ো বেশি ওজনদার গুণিন-পাশের বাড়ির দিকে চোখ মট মট করে তাকায়। নারানের দিদির বাড়ি ওটা। একা বিধবা মানুষ, তিন পুতের মাথা খেয়ে দিব্যি যাত্রা দেখতে যায় মিলের গেটে। তারই কাজ। অন্তত নাদু ঠাকুর এমনই বলেছে।

মনতোষ আসল রহস্য ভাঙছে না। টোকা তোলার নামে সে এক এলাহি ব্যাপার শুরু করে দিতেই ঝুমির মাথা খারাপ। তার মাথা কুটতে ইচ্ছে হচ্ছে। ছোটোকাকার বুজরুকি—এবং সত্যি যখন টোকাখানা দিনের শেষে তুলে আনল, তখন পাড়াপড়শির ছোটাছুটি—পাওয়া গেছে। ডালিম গাছের নীচে কে পুঁতে রেখেছিল। পাওয়া গেছে।

পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে, টোকা পুঁতে রেখেছিল কে? ডালিম তলায় চুপিসারে কে কাজ সেরে গেছে—কবে কখন, ওই মাল আসে—তা বলতে পারছে না। সবাই হামলে পড়ছে টোকাখান উপুড় হয়ে দেখার জন্য—মানা মানে মনতোষের এক রা না—টোকা তার মতো থাকুক—সে কলাপাতায় মুড়ে টোকাখান দিব্যি মাথায় নিয়ে নাচানাচি করছিল। ঠাকমা বারান্দার ছোটো পুত্রের নাচ দেখছে, টাকা, বাকি টাকা গস্ত করতে পারলেই সে টোকাখান গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে আসবে। বাকির কারবার সে করে না।

সবাই বলল, কী আছে।

মনা বলল, কী নেই। কী না লাগে বশীকরণ করতে যারা মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাদের কাছে বলি, টোকার ভেতরে আছে মধু, প্যাঁচার কান, প্যাঁচার চোখ, প্যাঁচার মাংস। চটক পাখির চোখ, সাপের খোলস।

আছে কাকজংঘা।

আমার টাকা কই। লাফ মনার।

লোকের ভিড়। ঝুমি চোরের মতো ঘরের কোণায় বসে। পাত্রপক্ষ এবারেও উধাও। ঝুমির কান ঝা ঝা করছে। হঠাৎ সে বের হয়ে চিল্কার করতে থাকল, ঠাম্মা টাকা দিলে আমার মরা মুখ দেখবে। ঝুমির বিশ্বাস কাকার ছলচাতুরি সব, ঠাকুমার কাছ থেকে টাকা হাতাবার ধান্দা।

মনা বলছে, রাক্ষসী তন্ত্রের বিধান। না মানলে চোখ অন্ধকার। সে টোকা মাথায় নিয়ে নাচছে। নেচে বেড়াচ্ছে। টাকা, বাকি টাকা চাই।

মাঝে মাঝে শুধু হাঁকছে, টাকা কই।

তার লুঙ্গি খসে যাবার উপক্রম। সে কোনোরকমে এক হাতে লুঙ্গি সামলাচ্ছে আর জয় রাক্ষসীতন্ত্র। তর তন্ত্রে তরে যামু।

আসারনাম মনা ঠাকুর। নাদু ঠাকুর গুরুকাকা।

তারপরই হাঁকছে—বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে বশীভূত করার জন্য চাই কিংবা চিরদাসত্বে বন্দি করার জন্যও বিধান আছে। আমার ভাইঝিরে পছন্দ না। দ্যাখ

ব্যাটারা কী হয়!

তারপরই হাঁক, টাকা কই! বড়োপিসি আর না পেরে বলল, মা টাকা দাও শিগগির। তোমার পোলা এখন নাদু ঠাকুর।

কী বিধান ঠাকুর?

বিধান আছে, বামনহাটি, বচ, পিপুল পায়রার বিষ্ঠা সৈন্ধব লবণ, প্রিয় তণ্ডুল, খঞ্জন পাখির মাংস শোল মাছের চোখ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে যৌনাঙ্গে লেপন। বাস। কাম ফতো! পাত্র বল, স্বামী বল পরস্ত্রী বল সব শ্রীচরণের দাস। টোকাখান এবারে কী করমু কন!

তাড়াতাড়ি ঠাকুমা অর্থাৎ মোক্ষদা বুড়ি গুনে গুনে টাকা দিয়ে বলল, তুই আমার শ্রাদ্ধের অধিকারী বাপ। পেটের বাড়িতে আর টান নাই, শুকাইয়া গ্যাছে। গঙ্গায় যা, আমার শেষ আদ্যাশ্রাদ্ধের কাম সাইরা আয়।

লাফাতে লাফাতে মনা চলে গেল। সঙ্গে এক পাল কাচ্চা বাচ্চ গঙ্গাযাত্রা শুরু। কপালে রক্ত চন্দন লেপে, মনা রওনা হয়ে গেল।

তারপর ফিরে এল মনা বড়ো সাত্ত্বিক হয়ে। এসে ঘরে কাচা ধুতি পরল। এতদিনের ক্ষোভ জ্বালা ঝুমির উপর যেন নেওয়া গেল। প্রতিশোধ যারে কয়। গাছের ফল-পাকুড় খা

এবার। লাগানি ভাঙ্গানিতে কী হয় দ্যাখ! এর বিয়া হইব। দাদার টাকার দাম নাই। পুত্রগণ আমার উপবাসে থাকে, হাত ওঠে না। ঘরে ঢুকলে দূর দূর ছাই ছাই। এই ধীরু আবার এয়েছিস! আবার! ঠাকুমা খাবে না!

আর এক গরাস দিদি।

হাঁ-মুখ করে মোক্ষদা বুড়ির পাশে বসলে না দিয়ে পারা যায়! তুই ঝুমি নাতনি, পিণ্ডদানের কোনো অধিকার আছে তোর। কেবল পালন করে বুকের মধ্যে দুঃখ জমা হয়ে আছে। আমি ছোটোপুত্র—সারাদিন মায় আমারে শাপ-শাপান্ত করে—কয়, মর। নির্বংশ হয়ে যাবি। আমার কাঁঠাল কে নেয়! আমার গাছে আম থাকে না। তুই জোর করে দু-খানা গাছ বিক্রি কইরা দিলি! বাপের দোহাই মানলি না। দাদার চিঠি পড়ে উলঙ্গ হয়ে নাচলি—এই করবে। আসুক মহী না বলেছি তো আমার নামে কুত্তা পুষিস।

মনা এবার মোক্ষদা বুড়ির বারান্দায় এসে বসল। ঝুমির ইচ্ছা হচ্ছে এক কোপে গলাখান কেটে দেয়। ইতর। তার জীবন নিয়ে মজা করছে সবাই। কে বলেছে, পাত্র খুঁজে বেড়াতে। কেউ নেই। বাপ থেকেও নেই। মাও না। অপমান লজ্জায় ঘৃণায় ঝুমি কী করবে বুঝতে পারছে না। তখনই সে দেখল, ঠাকুমা দরজা ধরে বারান্দার দিকে এগোচ্ছে। চোখে কম দ্যাখে। হাতে লাঠি না থাকলে চলাফেরা করতে পারে না-কে যেন ডাকল।

আমি মা। তোমার ছোটো পুত্র। মনা। চোখে দেখতে পাওনা, তবু বাঁইচা থাকতে চাও। নাতনির ঠাই না করতে পারলে মরতে পারবা না কও। মাঝে মাঝে বাবায় রাতে আইসা শিয়রে বইসা ডাকে—তোমার এক কথা, স্বগগ সুখ! স্বগগ সুখ ভোগ কর একলা একলা, ঝুমিরে বিয়া না দিয়া যাইতে পারমু না।

তুই আমারে ডাকলি মনা।

হ মা। বস।

শোন আর একবার চেষ্টা কর। বলে মনতোষ একটা বিড়ি ধরাল।

আমি রোহিণী নক্ষত্রে বটগাছের পরগাছা নিয়ে আসব। বুঝলে। কী বললাম! সে বিড়িটা ফুক ফুক করে টানছে।

বটগাছ বললি!

বটগাছ না, বটগাছের পরগাছা।

কী হবে!

হবে। সব হবে। রোহিণী নক্ষত্রে বটগাছের পরগাছা নিয়ে হাতে রাখলে রাজা থেকে শুরু করে, দুষ্টা স্ত্রী, লম্পট স্বামী, প্রভু, পতি, পশুপাখি পর্যন্ত বশীভূত থাকে। এই একটা উপায় মাথায় খেলছে। আর ভূর্জপত্রে ষড়যন্ত্র এঁকে একটি করোটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ওটি এবার পুঁতে দেব। তুমি খোঁজ কর পাত্রের।

দিদি, দিদি। মনতোষ জানে দিদি ঘরের ভিতরেই আছে।

ভিতরে ঝুমির বড়পিসি মুখ গোমড়া করে বসে আছে। আজই ভেবেছে, দাদাকে সব জানিয়ে চিঠি লিখবে! কী আরম্ভ করেছে মনা। তুই কিছু বলবি না দাদা! এভাবে ঝুমিকে নিয়ে কেলেঙ্কারি করলি। টাকা নিলি! মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যায় না!

দিদি হঠাৎ বের হয়ে চিৎকার করে বলল, তোর মুখ দেখলেও পাপ। তারপর হন হন করে হেঁটে গেল। বড়ো রাস্তায় রিকশা ধরে শহরে চলে যাবে, না হয় বাসে।

মনা বলল, যা বাব্বা। যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। এত অধর্ম সইবে! কলিকাল।

আর তখনই দুজন পুলিশ আমগাছ তলায় দাঁড়িয়ে কাকে খুঁজছে। পুলিশের সঙ্গে পঞ্চায়েত মেম্বার প্রবোধ দাস। প্রবোধ দাসই ডাকল, মনা ঠাকুর আছ!

পুলিশ দেখলে মনতোষের আজকাল বুক গলা শুকিয়ে যায়। উঠে চম্পট দেবে ভাবল,

কিন্তু সঙ্গে প্রবোধ দাস–নিশ্চয়ই অন্য কোনও কার্যকারণ আছে। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, দাদা আপনি!

থানা থেকে এসেছেন। তোমার কলকাতার দাদা দু-দিন হল নিখোঁজ। কাগজে দ্যাখনি!

না তো!

আর কাগজ! মনে হল চড়াৎ করে মাথায় কাগে হেগে দিল—দাদা নিখোঁজ! তার মানে দাদা কোথায়! দাদার সংসারে অশান্তি চোখের উপর দেখে এসেছে। দাদা নিজেই বাড়িতে তস্করের মতো হাঁটাহাঁটি করত। সন্ত্রাস। সন্ত্রাসে পড়ে দাদা চোখে মুখে বোধহয় আর পথ দেখতে পায়নি। বৌদিও সারা জীবন ঘোড়ার মতো ছুটিয়েছে। মনে হল এক নারী অশ্বপৃষ্ঠে বসে কেবল চাবুক মারছে।

সে সহসা চিৎকার করে উঠল! আরে তোরা কে কোথায়? মা মা। ওগো শুনছ সরলা। দাদা নিখোঁজ।

আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে বজ্রপাত যেন। মনতোষ তন্ত্রমন্ত্র ভুলে গেল। মাসোহারা বন্ধ। কী করবে! সে দেখল, মা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কোপানো উঠোনের উপর দিয়ে ছুটে আসতে

গিয়ে পড়ে গেল। ঝুমি কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। শিবতোষ খবর পেয়ে ছুটে এসেছে।

পুলিশ বিশেষ কিছু বলতে পারল না। যদি এখানে চলে আসে–তারবার্তায় খবর।

পুলিশ আর কী খবর নেবে বুঝল না।

তখনই ঝুমি গাছতলায় ছুটে এসে বসে পড়ল। বলল, কাল সকালে, ফর্সা হয়নি, দেখি কে আমগাছটার নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এত সকালে কাকা কী করে আসবে! চোখের ভুল—পরে দেখি সত্যি নেই।

মোক্ষন্দা ছুটে এসে বিলাপ শুরু করে দিল, বাবারে—কার কাছে রেখে গেলিরে! আমার কী হবে। আমাকে কে দেখবে— ঝুমির বিয়ে কে দেবেরে বাবা!

শিবতোষ বলল, কবে থেকে নিখোঁজ?

ওরা কাগজ বের করে সব দেখল। বলল, দু-দিন হল। সকালে বাড়ির কাজের মেয়ে দেখে তিনি নেই। অফিসের কোনও কাজেও বাইরে যায়নি। কেউ কিছু জানে না।

শিবতোষ মাকে এক ধমক লাগাল।

থামবে! কী আরম্ভ করলে তোমরা!

সব চুপ।

বাড়িটার চারপাশে গাছপালা জঙ্গল, বাঁশঝাড়–দাদা এলে কী আর জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াবে। হয় কখনও! ঝুমি দেখেছে। তবে দাদা বেঁচে নেই। শেষবারের মতো তার প্রিয় ঘরবাড়ি দেখার জন্য বিদেহী আত্মা স্বরূপ ধারণ করে দাঁড়িয়েছিল। দাদার কোনো অর্থাভাব নেই, কিন্তু অশান্তির চোটে ইদানীং খুবই কম। কথা বলতেন। বছর তিনেক হল বাড়িমুখো হয়নি। বাড়িতে মাটির ঘরে কষ্ট। মা তালপাতার পাখায় হাওয়া করলে বলত, না, না আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। বলত, বাড়িতে এলে আমার পরমায়ু বাড়ে। সেই দাদা নিখোঁজ।

দাদাকে বৌদি কিছুতেই বাড়ি আসতে দিত না। শিবতোষের চোখ ফেটে জল বের হয়ে এল। ভাই বোন-অন্ত প্রাণ। সেই দাদা বৌদিকে বাড়ি যাবে বললেই ক্ষেপে যেত। অশান্তি করত। ওটা বাড়ি না জঙ্গল। গরমে মরে যাবে না। শীতের দিনে বলত, ঠান্ডা লাগিয়ে অসুখ বিসুখ বাধালে আমি জানি না। কে করে? আসবে কেউ-কেউ এসে সেবা করবে? টাকা ছাড়াতো তারা কিছু বোঝে না। সব ঘাড়ে চাপিয়ে মুক্ত পুরুষ। দাদা বৌদির কথায় অতিষ্ট হয়ে উঠলে বলত বুঝছ না, আমি সেখানে ভাই বোনদের সঙ্গে

বড়ো হয়েছি। আমাদের কী দিন গেছে! গাছপালা মাঠ আমার কত প্রিয় বোঝ না। আমার শেকড় উপড়ে ফেলছ কেন?

তখন মহীতোষ হাঁটছে। গালে বাসি দাড়ি। পাজামা পাঞ্জাবি ময়লা। সে দু-রাত কিছু খায়নি। নিজেকে এই কষ্ট দেওয়ার মধ্যে সে যেন কোনো আনন্দ পাচ্ছে। নিজের সঙ্গে কথা বলছে— কী মহী কোথায় যাবে বলে রওনা হয়েছিলে-জঙ্গলে রাত কাটাতে মন্দ লাগে না! সাপ, খোপের আতঙ্কে তোমার বৌ তো গাঁয়ের বাড়িতে আসতেই দিত না। কবজা করে ফেলল। বাড়িতে কী দেখলে! কার জন্য দৌড় শুরু করেছিলে।

এখানটায় চুপচাপ বসা যাক কী বল!

মহীতোষ দেখল সড়ক থেকে অনেক দূরে একটা কবরখানায় সে হেঁটে যাচ্ছে। ভাঙা পাঁচিল, মিনার মসজিদ, একটা লম্বা শান কবরের উপর। আহা কী আরাম, সে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল। ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই। দাহ ভিতরে ছিল— এই গভীর বনের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তার মনে হল, ভালোই আছে। তার ঘুম পাচ্ছিল।

সে শুয়ে আছে।

অদ্ভুত সব দৃশ্য ভেসে উঠছে।

সে বড়ো হবার মুখে বড়ো অভাবের সময়। মনতোষকে কোলে নিয়ে সে ঘুরছে। মাঠে নেমে গেছে-মনে মনে পরীক্ষার পড়া ঝালিয়ে নিচ্ছে। মনতোষ তার পুত্রবৎ বয়সে। সেই মনতোষ এখন মনা ঠাকুর হয়ে গেছে। বারান্দায় খেতে বসলে মনতোষ তার পাশে বসত। সে খাইয়ে না দিলে মনতোষ খেত না। ওর দুই পুত্রের কথাও মনে হল। নাতির কথা মনে হল, সন্দেশ কলা পাউরুটি ডিমের পোচ দিয়ে শুরু আঙুর দিয়ে শেষ। খেতে চায় না। খাবার নিয়ে পুত্রবধূর অশান্তির ছবিও ভেসে উঠল। কত রকমের বাহানা।

দুই উলঙ্গ শিশু।

বাড়িতে গেছে। ধীরুর তখন বছর তিনেক বয়স।

সে বাড়ি গেলেই ধীরু তারক সামনে। কত কথা।

যেমন বলত, জান জেঠু আমি রসগোল্লা খাই।

সে বলত, আর কী খাও!

পাউরুটি খাই। ইস্কুলে জান পাউরুটি দেয়। তারপর আবার বলেছিল, আমি রসগোল্লা খাই।

আর কী খাও?

আমি ভাত খাই ডাল খাই পাউরুট খাই। রসগোল্লা খাই।

আসলে যেন বড়োলোক জেঠুকে খবর দেওয়া সে রসগোল্লা খায় না এমন কেউ বললে মিছে কথা হবে।

মহীতোষ এক হাঁড়ি রসগোল্লা আনিয়ে ভেবেছিল, ভাইপো ভাইঝিদের পেট ভরে রসগোল্লা খাওয়াবে।

ধীরুকে বলেছিল সে।

ধীরু সব সময় দু-হাত পেছনে রেখে দাঁড়ায়। পেট শ্রীঘটের মতো। অপুষ্টিজনিত এই শরীর। সে বোঝে। কিন্তু যা কিছু করে গোপনে–এমনকী একবার খবর পেয়ে তার চাবি সিজ করে ফেলল। সে অশান্তিকে বড়ো ডরায়।

ধীরু এক হাতে রসগোল্লা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

মহীতোষ ভেবেছিল, একটা করে খাবে, একটা করে দেবে। আশ্চর্য ধীরু কিছুতেই হাতের রসগোল্লা খেল না।

মহীতোষের মধ্যেও ছেলেমানুষি প্রবল হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, খা আবার দেব।

ধীরু ডান হাত পেতে বলেছিল, দাও।

আরে ওটা খা, খেলে তো দেব।

ধীরু কিছুতেই জেঠুকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সবাইকে দিল, টপাটপ খাচ্ছে। কিন্তু ধীরুকে আর একটা না দিলে হাতেরটা খাবে না। সত্যি খেল না। রসগোল্লার হাঁড়ি শেষ। পাঁচ-সাতজন ভাইপো ভাইঝি—কতক্ষণ লাগে। ধীরু ওই রসগোল্লাটি নিয়ে, গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়ালো। চিমটি কেটে মুখে দিচ্ছে। ফুরিয়ে গেলে তো আর পাবে না। ঘণ্টাখানেক পরেও মহীতোষ দেখেছিল, সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে চিমটি কেটে রসগোল্লার স্বাদ নিচ্ছে ধীরু। মহীতোষ কত বড়ো অমানুষ সেদিনই টের পেয়েছিল। সে তার স্ত্রী এবং পুত্রদের স্বার্থে—নিজের পৃথিবী থেকে কখন যে অজ্ঞাতবাসে চলে গেছে সেদিনই টের পেয়েছিল।

মহীতোষ বুঝতে পারছে জীবনে বেঁচে থাকার সব রহস্যই তার মুছে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে বয়সের তাড়না শুরু হয়ে গেছে জীবনে। সবাই যে যার মতো আত্মসর্বস্ব, স্বার্থপর।

কিছুই আর তার ভালো লাগে না।

কোনও ঋতুই আর তার জন্য নতুন খবর বয়ে আনে না।

সে নদীর পাড়ের মানুষ। একা একা হেঁটে যাচ্ছে।

আকাশে মেঘ, কখনও বজ্রপাত অথবা নীল আকাশ এবং নক্ষত্রমালা—কিছুই চমক সৃষ্টি করে না আর। যেন এভাবেই মানুষের জন্ম হয়, মৃত্যু হয়, শেষ হয়। সব। তবু শৈশব এক রকমের, যৌবন এক রকমের। প্রৌঢ় বয়সে সে বোঝে ভারি একা। নদীর পাড়ের মানুষ হয়ে যায়। ঘরে মন টেকে না, কেবল বের হয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। কেমন ঘোরের মধ্যেই সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

তবে কোথায় সে যাবে জানে না।

সবকিছু অর্থহীন, জীবন এবং বেঁচে থাকা। মৃত্যুর অধিক বেঁচে থাকা আহাম্মকের প্রলাপ।

এই সব তাড়নায় যখন সে পাগল, তখনই চকিতে মনে হয় কে তাকে খণ্ড খণ্ডভাবে রেখে এসেছে নদীর চরায়, কাশফুলের মাঠে, গয়না নৌকার পাটাতনে। কিংবা দূরে মামার বাড়ি যাবার পথে কোনো বুড়ো নিমের ছায়ায়।

তার চোখ জলে ভেসে যায়।

আর তখনই মনে হল দূরে হল্লা।

সে শানের উপর উঠে বসল। এদিকটায় তবে কোনো গ্রাম আছে। সে হেঁটে যেতে থাকল। ঘাস বনজঙ্গল মাড়িয়ে সে যাচ্ছে। সে যে মহীতোষ, সে যে কৃতী মানুষ, সে যে কলকাতায় তার ভোগের সর্বস্ব ফেলে চলে এসেছে দেখলে মনেই হবে না। সামনে পুকুর, পরে রেল লাইন, দূরে কোনো স্কুলবাড়ি। আরও দূরে স্টেশনে সিগনাল। সে হেঁটে গিয়ে দেখল পুকুর পাড়ে তারই মতো একটা লোক শুয়ে আছে। খবর পেয়ে মানুষজন ছুটে আসছে। স্টেশনের কাছাকাছি এলাকা, দূরে ধুধু মাঠ ছাড়া সামনে আর কিছু চোখে পড়ে না। সে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গাঁয়ের কিছু মানুষ লোকটাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যেতে চাইছে। কেন বুঝছে না। আর তখনই দেখল, হাতে একটা বিশাল কাঁকড়া থাবা বসিয়ে দিয়েছে। আঙুলের দু-পাশে সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে কাঁকড়ার বিশাল ঠ্যাং। গোরু চরাতে এসে পুকুরের তলানিতে শামুক গুগলি খুঁজতে গিয়ে এই মরণ।

আঙুল থেকে চুইয়ে রক্ত পড়ছে।

এই মাধা, কী বলছে ব্যাটা। কাঁকড়াটা মার।

মাধা বলছে, না লাগবে।

মাধা বলছে, ওয় থাক, আমমো থাকি।

কাঁকড়ার কামড় হজম করছে মাধা। ভিড়ের মধ্যে মহীতোষকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। স্টেশনে নানা কিসিমের বেওয়ারিশ লোক ঘুরে বেড়ায়। মহীতোষ তাদের একজন হয়ে গেছে।

ইস কী কষ্ট।

হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে। কাউকে কাছে আসতে দিচ্ছে না। কাঁকড়ার কামড়!

মাধা কেবল বলছে, ওয় থাক, আমমো থাকি। মেঘ না ডাকলে কামড় ছাড়বে না। মহীতোষ ভাবল, ওয় থাক, আমিও থাকি, ভারী সার কথা বলছে তো লোকটা!

কাঁকড়াটা মেরে ফেললেই হয়!

বা বাবু। বড়ো কামড়। মরে গেলে শেষ কামড় বসাবে। হাড় ফুটো করে দেবে। মহীতোষ এ-দৃশ্য দেখেনি। জানে না, তাহলে কাঁকড়ার কামড় মেঘ গুড়গুড় না করলে খোলে না। সে কেমন আহাম্মকের মতো দেখল শুধু।

কে একজন বলল। শালো ব্যাটা কাঁকড়ার গহ্বরে হাত! বোঝ। ধরতে জানিস না!

মাধার এক কথা, না ধরবে না। কাছে আসবে না। আর যেই না পাঁজাকোলে করে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা—তখনই দৌড়। মাঠের উপর দিয়ে দৌড়োচ্ছে। আগুনের হলকা রোদে। খরায় জ্বলছে সব। মাঠ ঊষর হয়ে আছে। ফাটল বড়ো বড়ো মাটির পিঠে। কুমিরের চামড়ার মতো উঁচুনীচু জমির উপর দিয়ে ছুটছে। মেঘ না ডাকলে আঙুল থেকে কাঁকড়া খুলে পড়বে না। মরে গেলে কাঁকড়ার ঠ্যাং এর সাঁড়াশি-দাঁত হাড় ফুটো করে বসে যাবে। সেই ত্রাসে মাধা ছুটছে।

মহীতোষ দেখল, গামছা, জ্যালজ্যালে গামছা পরনে একজন মানুষ হাতে কাঁকড়া ঝুলিয়ে চড়া রোদের ভেতর দিয়ে ছুটছে। দিগন্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে। কোনোও গাছতলায় শুয়ে থাকবে আবার। মেঘবৃষ্টির জন্য এই নিরন্তর অপেক্ষা বুঝি সব মানুষের।

মহীতোষ বুঝল লোকটা আসলে সে নিজে।

তারও এখন দরকার কোনো গাছের ছায়ায় চুপচাপ বসে থাকা। কিংবা শুয়ে থাকা। গাছের ছায়ার জন্য সে হেঁটে যেতে থাকল। সঙ্গে একটা বেহালা থাকলে বড়ো ভালো হত। সুমার মাঠে কেন যে তার ইচ্ছে হল বেহালা বাজাতে বাজতে চলে যায়।

তার এই ইচ্ছের কথা ভেবে সে আর মুহূর্ত মাত্র দেরি করল না। লোকটা যেদিকে গেছে সেদিকটায় ধাওয়া করল। পারল না। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আর উঠল না।

মাঠচরার দল ঝড়বৃষ্টি ভেঙে বাড়ি ফেরার পথে দেখল, একজন মানুষ সুমার মাঠে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

বাজ পড়ে মারা যেতে পারে।

গাঁয়ে তারা খবরটা পৌঁছে দিল শুধু।